ইউনিট ৪

আসমানী কিতাব ও মালাইকা

মহান আল্লাহ দুনিয়ার মানুষকে হেদায়াতের জন্য যুগে যুগে নবী-রাসূলদের কাছে ওহীর মাধ্যমে তাঁর বাণী বা বিধি-বিধান প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলার ঐ বাণী সমষ্টিকেই আসমানী কিতাব বলা হয়। আসমানী কিতাবে বিশ্বাস ইসলামী আকীদার একটি মৌলিক বিষয়। আসমানী কিতাবের প্রতি বিশ্বাসে গরমিল থাকলে ঈমানে পরিপূর্ণতা আসে না। আসমানী কিতাবই হচ্ছে একমাত্র নির্ভরযোগ্য হিদায়াতের মাধ্যম, চলার পথের পাথেয়। এ দুনিয়াতে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য, উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পদ্ধতি, মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ এতে আলোচিত হয়েছে। আসমানী কিতাবই হচ্ছে মানুষের পথনির্দেশিকা বা জীবন বিধান। পৃথিবীতে মানুষের সূচনার সময় থেকে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স) পর্যন্ত অগণিত নবী-রাসূলের মধ্যে যুগে যুগে বাছাইকৃত নবী-রাসূলের কাছে আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে। এর সংখ্যা ১০৪ খানা। তার মধ্যে তাওরাত, যাবুর, ইনজীল ও কুরআন মাজীদ প্রধান কিতাব। বাকী একশতটি সহীফা। কুরআন শরীফ ব্যতীত বর্তমানে অন্যান্য আসমানী কিতাবের অবিকল অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। ঐগুলোর বিধান কুরআন নাযিল হওয়ার সাথে সাথে রহিত করা হয়েছে। এখন কিয়ামত পর্যন্ত পবিত্র কুরআন থেকেই বিশ্ব মানবতাকে হিদায়াতের সন্ধান গ্রহণ করতে হবে।

এ ইউনিটের পাঠগুলো নিম্নরূপ

- ❖ পাঠ-১ : আসমানী কিতাবের পরিচয় ও এর প্রতি বিশ্বাস
- ❖ পাঠ-২ : সর্বশেষ আসমানী কিতাব আল-কুরআন
- ❖ পাঠ-৩ : মালাইকার পরিচয় ও তাঁদের দায়িত্ব

পাঠ-১

আসমানী কিতাবের পরিচয় ও এর প্রতি বিশ্বাস

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- আসমানী কিতাবের পরিচয় দিতে পারবেন;
- আসমানী কিতাবের আলোচ্য বিষয় বলতে পারবেন;
- আসমানী কিতাবের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- আসমানী কিতাব নাযিলের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- আসমানী কিতাবের সংখ্যা ও অস্তিত্ব বিষয়ে বিবরণ দিতে পারবেন;
- আসমানী কিতাবের প্রতি বিশ্বাস সম্বন্ধে বর্ণনা দিতে পারবেন।

আসমানী কিতাবের পরিচয়

আসমানী কিতাব ইসলামী বিশ্বাসের একটি মৌলিক বিষয়। সাতটি বিষয়ের ওপর বিশ্বাস স্থাপনের নাম ঈমান, তার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে আসমানী কিতাবে বিশ্বাস। আসমানী কিতাবের প্রতি বিশ্বাসে যদি অতি সামান্যতম গরমিল থাকে তাহলে ঈমান নামক অমূল্য রত্নের মাঝে ত্রুটি দেখা দেবে। আসমানী কিতাব হচ্ছে ঐ কিতাব যা যুগে যুগে মানবতার হিদায়াতের জন্য আল্লাহ তাঁর বাছাইকৃত নবী-রাসূলগণের ওপর নাযিল করেছেন। আসমানী কিতাবই হচ্ছে একমাত্র নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ, যা বিভ্রান্ত মানবতাকে সত্য, সুন্দর ও সৎ পথের সন্ধান দিয়ে থাকে।

আল্লাহ দুনিয়ার মানুষের হিদায়াতের জন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবী ও রাসূলের মাধ্যমে তাঁর বাণী প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলার ঐ বাণীকেই আসমানী কিতাব বলা হয়।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দুনিয়ার মানুষের হিদায়াতের জন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবী ও রাসূলের মাধ্যমে তাঁর বাণী বা বিধি-বিধান প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলার ঐ বাণীকেই আসমানী কিতাব বলা হয়। অন্য কথায় যে সকল গ্রন্থে আল্লাহ তা'আলার বাণী বা ওহী লিপিবদ্ধ রয়েছে, তাকে আসমানী কিতাব বলা হয়। আল্লাহর আদেশ-নিষেধ, বিধি-বিধান সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার নিয়ম-নীতি ইত্যাদি যা কিছু তিনি নবী-রাসূলগণের নিকট পাঠিয়েছেন তার সবই আসমানী কিতাবের আলোচ্য বিষয়।

আসমানী কিতাবের আলোচ্য বিষয়

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আসমানী গ্রন্থসমূহে তার সৃষ্টির বর্ণনা দিয়ে তার সৃষ্টি বৈচিত্র্য সম্পর্কে মানব জাতিকে সম্যক ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেছেন। আল্লাহর পরিচয়, তাঁর ক্ষমতা, তাঁর সার্বভৌমত্ব, তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত ইত্যাদি সম্পর্কে এতে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এ দুনিয়াতে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য, মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহও এতে আলোচিত হয়েছে। তাছাড়া দুনিয়াতে মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনের বিভিন্ন দিকের বিধি-বিধানও এতে সবিস্তারে বিধৃত হয়েছে। বেহেশত ও দোযখের চিত্র এবং কারা এ বেহেশতের অধিকারী হবেন এবং কারা দোযখের অধিবাসী হবে তারও বর্ণনা এতে দেয়া হয়েছে। মোটকথা আসামনী কিতাবই হচ্ছে মানুষের পথনির্দেশিকা বা জীবন বিধান।

আসমানী কিতাবের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

মানব জীবনে আসমানী কিতাবের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। মানুষকে একদিকে যেমন আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে, তেমনি তাদেরকে আসমানী কিতাবের মাধ্যমে দুনিয়াতে চলা-ফেরা, আচার-আচরণ, লেন-দেন, রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য বিভিন্ন বিধান দেওয়া হয়েছে। এসব বিধি-বিধান দেয়া না হলে মানুষ তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য কী, তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কী, তা জানতে পারত না। ফলে তার জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে সে সঠিক দিকনির্দেশনা পেত না। এ দিকনির্দেশনার অভাবে সে তার জীবনের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারত না। আল্লাহ তা'আলা আসমানী কিতাবের মাধ্যমে আমাদেরকে এসব বিষয়ে শিক্ষাদান করেছেন। যেমন-আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা

ঘোষণা করেছেন-

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ

"আমি সকল রাসূলকে তার স্বজাতির ভাষাভাষি করে প্রেরণ করেছি, তাদের নিকট পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করবার জন্য।" (সূরা ইবরাহীম : ৪)

আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক জাতির জন্য যুগে যুগে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন যেন তারা আল্লাহর একত্ববাদকে স্বীকার করে নেয়। আসমানী কিতাব প্রেরণ না করলে যুগে যুগে বিভিন্ন জাতি এ হিদায়াতের বাণী থেকে বঞ্চিত হয়ে দিশেহারা হয়ে যেত। কারণ আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনের প্রথম সূরায় উল্লেখ করেছেন-

عَلَّمَ ٱلإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

"তিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানত না।" (সূরা আল-আলাক : ৫)

আসমানী কিতাব প্রেরণের অন্য একটি প্রয়োজনীয়তা হল, এর দ্বারা মানুষের বাহ্যিক শরীরকে বাইরের ময়লা থেকে এবং তাদের অন্তরসমূহকে দুনিয়ার চাকচিক্য ও শয়তানের প্রতারণা থেকে পবিত্র করা। আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেন-

هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ

"তিনিই উম্মীদের মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য হতে, যে তাদের নিকট আবৃত্তি করে তাঁর আয়াতসমূহ এবং তাদের পবিত্র করে।" (সূরা আল-জুমুআহ : ২)

আসমানী কিতাব প্রেরণ করে আল্লাহ তা'আলা মানুষদের পরকালে পেশকৃত ওযর আপত্তির জবাব দিয়েছেন, যেন মানুষ পরকালে বলতে না পারে যে, আপনি আমাদের নিকট কোন কিতাব পাঠাননি, যদি পাঠাতেন তাহলে আমরা তা শুনতান। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌ

"যাতে রাসূল আসার পর আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে।" (সূরা আন-নিসা : ১৬৫)

আল্লাহ তা'আলা কোন জাতির কাছে আসমানী কিতাব না পাঠিয়ে তাকে শাস্তি দেন না। সুতরাং যারা ধ্বংসের পথ বেছে নেয়, তারা যেন দলীল-প্রমাণ দেখার পরই বেছে নেয়। এছাড়া যারা মুক্তির পথ পছন্দ করে তারাও যেন দলীল-প্রমাণ দেখার পরই তা করে। যেমন আল্লাহ বলেন-

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولاً

"আমি রাসূল না পাঠান পর্যন্ত কাউকে শাস্তি দেই না।" (সূরা আল-ইসরা : ১৫)

এ সকল আলোচনার ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি যে, মানব জীবনে আসমানী কিতাবের গুরুত্ব অপরিসীম।

আসমানী কিতাব নাযিলের উদ্দেশ্য

পৃথিবীতে নবী-রাসূলগণের ওপর যত কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তার সবই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অবতারিত অমোঘ বাণী। আর এ বাণী প্রেরণ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহর সাথে বান্দার তথা আবদ ও মাবুদ-এর সম্পর্ক ও পরিচয় করিয়ে দেয়া। এ সম্পর্ক কিভাবে বজায় রাখতে হবে, কিতাব তা বাতলে দেয়। আসমানী কিতাবের উদ্দেশ্য হচ্ছে পথভ্রষ্ট, দিকভ্রান্ত বিশ্ব মানবতাকে হিদায়াত করা, সহজ সরল পথে পরিচালিত করা, মানবজীবনের উদ্দেশ্যকে সফল করে তোলা এবং মানব সমাজকে কল্যাণের পথে আহবান করা।

আসমানী কিতাবের উদ্দেশ্য হচ্ছে-পথভ্রষ্ট, দিকভ্রান্ত বিশ্ব মানবতাকে হিদায়াত করা, সহজ সরল পথে পরিচালিত করা, মানবজীবনের উদ্দেশ্যকে সফল করে তোলা এবং মানব সমাজকে কল্যাণের পথে আহবান করা।

হক-বাতিল, ন্যায়-অন্যায় এবং সত্য-অসত্যের মধ্যে পার্থক্য এবং বিভিন্ন আদেশ-নিষেধ সম্বলিত বিধি-বিধান, প্রতিশ্রুতি ও শাস্তির বিষয় বর্ণনা করাই হচ্ছে আসমানী কিতাব নাযিলের উদ্দেশ্য। সর্বোপরি

শয়তানী শক্তির বেড়াজাল হতে আল্লাহর বান্দাদের বের করে আনা এবং সকল মতবাদের ওপর ইসলামের বিজয় সাধন করে মানবতাকে মুক্তি দেয়াই আসমানী কিতাব নাযিল করার লক্ষ্য। আল্লাহ আসমানী কিতাব প্রেরণের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন-

هُوَ ٱلَّذِيٓ أَرۡسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلۡهُدَىٰ وَدِينِ ٱلۡحَقِّ لِيُظۡهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ

"তিনিই তাঁর রাসূলকে পথনির্দেশ ও সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন, অপর সমস্ত দীনের উপর একে জয়যুক্ত করার জন্য।" (সূরা আল-ফাতহ : ২৮)

আসমানী কিতাব নাযিলের অপর উদ্দেশ্য বর্ণনায় আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (স)-কে সম্বোধন করে বলেন, এ কিতাব আপনার প্রতি নাযিল করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, আপনি লোকদেরকে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে হিদায়াতের আলোকজ্জ্বল পথের দিকে বের করে নিয়ে আসবেন।' (সূরা ইবরাহীম : ১)

إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِتَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ

"আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি আল্লাহ তোমাকে যা জানিয়েছেন সেই অনুসারে মানুষের মধ্যে বিচার মীমাংসা কর।" (সূরা আন-নিসা : ১০৫)

আসমানী কিতাবের সংখ্যা

শরহে উমদাতুল ক্বারী গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আসমানী কিতাবের সংখ্যা ১০৪ খানা। যেমন- হযরত আবু যার গিফারী (রা) হতে বর্ণিত। সে সকল রাসূলের প্রতি আল্লাহর বাণী কিতাব ও সহীফা আকারে নাযিল হয়েছে, এ কিতাব এবং সহীফার সর্বমোট সংখ্যা ১০৪ খানা। এ সকল আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে সহীফা বা ছোট কিতাব ১ শ খানা। হযরত শীছ (আ)-এর প্রতি ৫০ খানা, হযরত ইদরীস (আ)-এর প্রতি ৩০ খানা। হযরত ইবরাহীম (আ) প্রতি ১০ খানা এবং হযরত আদম (আ)-এর প্রতি ১০ খানা অবতীর্ণ হয়েছিল।"

বাকি ৪ খানা হল প্রধান এবং প্রসিদ্ধ আসমানী কিতাব। এ ৪টি প্রধান আসমানী কিতাব পর্যায়ক্রমে, তাওরাত বনী ইসরাইলকে হিদায়াতের জন্য হযরত মুসা (আ)-এর প্রতি; যাবুর হযরত দাউদ (আ)-এর প্রতি; ইনজীল হযরত ঈসা (আ)-এর প্রতি এবং বিশ্ব মানবতার হিদায়াতের জন্য সর্বশেষ ও পূর্ববর্তী সমস্ত কিতাব রহিতকারী 'আল-কুরআন' সর্বশেষ নবী ও বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়।

আসমানী কিতাবসমূহের অস্তিত্ব

লাওহে মাহফুজে সমস্ত আসমানী কিতাব বিদ্যমান থাকলেও পৃথিবীর বুকে একমাত্র কুরআন ছাড়া অন্যান্য আসমানী কিতাব অনুপস্থিত। বর্তমানে কুরআন ছাড়া আসমানী কিতাবের নামে যে সকল কিতাব পাওয়া যায়, তার কোনটাই মূল ভাষা ও অর্থে সুরক্ষিত নেই। বরং সেগুলোতে রয়েছে ব্যাপক রদবদল। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

লাওহে মাহফুজে সমস্ত আসমানী কিতাব বিদ্যমান থাকলেও পৃথিবীর বুকে একমাত্র কুরআন ছাড়া অন্যান্য আসমানী কিতাব অনুপস্থিত। বর্তমানে কুরআন ছাড়া আসমানী কিতাবের নামে যে সকল কিতাব পাওয়া যায়, তার কোনটাই মূল ভাষা ও অর্থে সুরক্ষিত নেই।

يُحَرِّفُونَ ٱلۡكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِۦ

"তারা শব্দগুলোর আসল অর্থ বিকৃত করে।" (সূরা আল-মায়েদা : ১৩)

বুখতে নসর নামক একজন প্রতাপশালী ইয়াহূদীর শাসনামলে তাওরাত গ্রন্থ সম্পূর্ণ রূপে বিলীন হয়ে যায়। তখন লোকদের যা মুখস্থ ছিল তা লিপিবদ্ধ করে তার মধ্যে নিজেদের সুবিধামত রদবদল করে নিয়ে জনৈক বাদশাহ এটা ধংস করে দিরে ইয়াহূদী আলিমগণ তা জোড়াতালি দিয়ে একীভূত করে আর-এর মধ্যেও নিজেদের অনেক নতুন নতুন ধর্মীয় আচার-পদ্ধতি সংকলিত করে তার নাম দেয় সেপটুনাজেন্ট।

এ রূপে খ্রিস্টানদের কবল থেকে হযরত ঈসা (আ)-কে আকাশে উঠিয়ে নেয়ার পর ইনজীলের একটি মাত্র আসল কপি বর্তমান ছিল। খ্রিস্টানরা তা জ্বালিয়ে ফেলে। তারপর তাঁর অনুসারীগণের মধ্য হতে কিছু লোক হযরত ঈসা (আ) কর্তৃক বর্ণনা এবং ইনজিলের কিছু বিষয় যা তাদের স্মরণ ছিল এর সাথে

নিজেদের সুবিধামত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করে নেয়, যা বর্তমানে ইনজীল, মথী, লুক, মারকস, ওল্ড টেস্টামেন্ট, নিউ টেস্টামেন্ট ইত্যাদি নামে প্রসিদ্ধ।

আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর যে আসমানী কিতাব নাযিল হয়েছিল, বর্তমানে সেটাই একমাত্র কিতাব যা বিশ্ববাসীর সামনে আসল ও অবিকৃতরূপে বিদ্যমান। আল-কুরআনের একটি যের, জবর, পেশ কিংবা একটি নুকতাও পরিবর্তিত হয়নি। বরং এটা কিয়ামত পর্যন্ত প্রচলিত ও বলবৎ থাকবে। কারণ, এর সংরক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ নিজেই নিয়ে ঘোষণা করেন-

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

"আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই তার সংরক্ষক।" (সূরা আল-হিজর : ৯)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন-

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

"এর সংরক্ষণ ও পাঠ করাবার দায়িত্ব আমারই।" (সূরা আল-কিয়ামাহ : ১৭)

যেহেতু কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে অন্যান্য আসমানী কিতাবের বিধি-বিধান রহিত হয়ে গিয়েছে সেহেতু কুরআনই হচ্ছে আসমানী হিদায়াত ও ঐশী শিক্ষা সংক্রান্ত সর্বশেষ কিতাব। সুতরাং ঐশী হিদায়াতের অন্বেষণকারী ব্যক্তিদের জন্য এ সর্বশেষ কিতাবের অনুসরণ করা একান্ত অপরিহার্য।

কুরআন নাযিল হওয়ার সাথে সাথে অন্যান্য আসমানী কিতাবের বিধি-বিধান রহিত হয়ে গিয়েছে সেহেতু কুরআনই হচ্ছে আসমানী হিদায়াত ও ঐশী শিক্ষা সংক্রান্ত সর্বশেষ কিতাব।

আসমানী কিতাবের প্রতি বিশ্বাস

নবী-রাসূলগণের প্রতি যত কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, এগুলো সবই আল্লাহর পক্ষ হতে জিবরাঈল (আ)-এর মারফতে প্রেরিত। আসামানী কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস করা ঈমানের অঙ্গ। মুমিন মুসলমান হওয়ার জন্য যেমন সমস্ত নবী-রাসূলের প্রতি ঈমান আনা আবশ্যক, তেমনি সমস্ত আসমানী কিতাবের প্রতিও ঈমান আনা আবশ্যক। এটা ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত। এ মর্মে আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ

"তোমার প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা নাযিল হয়েছে তাতে যারা ঈমান আনে।" (সূরা আল-বাকারা : ৪)

মহান আল্লাহ আরো ঘোষণা করেন-

كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ

"তাদের সকলে আল্লাহে, তাঁর ফেরেশতাগণে, তাঁর কিতাবসমূহে এবং তাঁর রাসূলগণে ঈমান আনয়ন করেছে।" (সূরা আল-বাকারা : ২৮৫)

সারসংক্ষেপ

আসমানী কিতাব ইসলামী আকিদার একটি মৌলিক বিষয়। সাতটি বিষয়ের ওপর বিশ্বাস স্থাপনের নাম ঈমান। তার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে আসমানী কিতাব। আসমানী কিতাবের প্রতি বিশ্বাসে যদি অতি সামান্যতম গরমিল থাকে; তাহলে ঈমান নামক অমূল্য রত্নের মাঝে ত্রুটি দেখা দেবে সন্দেহাতীতভাবে। আসমানী কিতাব হচ্ছে, ঐ কিতাব যা যুগে যুগে মানবতার হিদায়াতের জন্য মহান আল্লাহ তার বাছাইকৃত নবী-রাসূলগণের ওপর নাযিল করেছেন। আসমানী কিতাবই হচ্ছে, একমাত্র নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ, যা বিভ্রান্ত মানবতাকে সত্য সুন্দর পথের সন্ধান দেয়।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দুনিয়ার মানুষের হিদায়াতের জন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবী ও রাসূলের মাধ্যমে তাঁর বাণী বা বিধি-বিধান প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলার ঐ বাণীকেই আসামনী কিতাব বলা হয়। অন্য কথায় যে সকল গ্রন্থে আল্লাহ তা'আলার বাণী বা ওহী লিপিবদ্ধ রয়েছে তাকে আসমানী কিতাব বলা হয়। আল্লাহর আদেশ-নিষেধ, বিধি-বিধান, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার নিয়ম-নীতি ইত্যাদি যা কিছু তিনি নবী-রাসূলদের নিকট পাঠিয়েছেন, তার সবই আসমানী কিতাবের আলোচ্য বিষয়।

আসমানী কিতাবের সংখ্যা ১০৪ খানা। এর মধ্যে প্রসিদ্ধ হল তাওরাত, যাবুর, ইনজীল ও কুরআন। বর্তমানে একমাত্র কুরআনের অস্তিত্ব ও শিক্ষা অবিকৃত অবস্থায় আছে। মানবজাতি কুরআন থেকেই তাদের পথের দিশা পেয়ে আসছে এবং ভবিষ্যতে ও পেতে থাকবে।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

▶ সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. আসমানী কিতাবে বিশ্বাস ইসলামী আকীদার একটি-
   ক. মৌলিক বিষয়; খ. অন্যতম বিষয়;
   গ. গৌণ বিষয়; ঘ. সামান্য বিষয়।

২. মানবতাকে সত্য, সুন্দর ও সুপথ প্রদর্শনের জন্য নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে-
   ক. আসমানী কিতাব; খ. জাতীয় সংসদ;
   গ. জাতিসংঘ সনদ; ঘ. সংবিধান।

৩. আসমানী কিতাবের সর্বমোট সংখ্যা কত?
   ক. ১১৪ খানা; খ. ৩০ খানা;
   গ. ১০৪ খানা; ঘ. ৪ খানা।

৪. প্রসিদ্ধ বা প্রধান আসমানী কিতাব কয় খানা?
   ক. ১৩০ খানা; খ. ১০৪ খানা;
   গ. ১০০ খানা; ঘ. ৪ খানা।

৫. পবিত্র কুরআন ব্যতীত অন্যান্য আসমানী কিতাব বর্তমানে কী অবস্থায় আছে?
   ক. অবিকৃত অবস্থায়; খ. খণ্ডিত আকারে;
   গ. বিকৃত অবস্থায়; ঘ. অবিকল ভাষায়।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. আসমানী কিতাবের পরিচয় দিন।
২. আসমানী কিতাবের আলোচ্য বিষয়বস্তু কী?
৩. আসমানী কিতাবের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।
৪. আসমানী কিতাব নাযিলের উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করুন।
৫. আসমানী কিতাবের সংখ্যা কত?
৬. আসমানী কিতাবসমূহের অস্তিত্ব বর্তমানে আছে কি? এ ব্যাপারে প্রামাণ্য ব্যাখ্যা দিন।
৭. আসমানী কিতাবের প্রতি কি বিশ্বাস রাখতে হবে?

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. আসমানী কিতাব সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখুন।

পাঠ-২

সর্বশেষ আসমানী কিতাব আল-কুরআন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- আল-কুরআন নাযিলের সময়কাল বলতে পারবেন;
- আল-কুরআন সর্বশেষ আসমানী কিতাব একথা প্রমাণ করতে পারবেন;
- আল-কুরআন যে চিরন্তন গ্রন্থ তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে আল-কুরআনের তাৎপর্য তুলে ধরতে পারবেন;
- কুরআন যে অতীব বিশুদ্ধ ও অবিকৃত আসমানী কিতাব তার প্রমাণ দিতে পারবেন;
- জীবন সমস্যার সমাধানে আল-কুরআনের ভূমিকা তুলে ধরতে পারবেন।

কুরআন নাযিলের সময়কাল

কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, কুরআন মাজীদ 'লাওহে মাহফুয' থেকে মহানবীর (স) কাছে দুটি পর্যায়ে নাযিল হয়েছে।

প্রথম পর্যায়ে মহান আল্লাহর আরশে আযীমে অবস্থিত 'লাওহে মাহফুয' বা 'সুরক্ষিত ফলক' হতে সম্পূর্ণ কুরআন একইসাথে রমযান মাসের মহিমান্বিত ক্বদর রজনীতে পৃথিবী সংলগ্ন আসমানের 'বায়তুল ইযযতে' নাযিল হয়। এ মর্মে মহান আল্লাহর ঘোষণা হচ্ছে :

شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ

"রমযান মাস, এতে মানুষের দিশারী কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।" (সূরা আল-বাকারা : ১৮৫)

إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ

"নিশ্চয় আমি কুরআন নাযিল করেছি মহিমান্বিত রাতে।" (সূরা আল-কদর : ১)

কদর রজনীতে কুরআন নাযিল হয়েছে' একথাটির তিনটি ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে-

১. লাওহে মাহফুয হতে সম্পূর্ণ কুরআন এ ক্বদর রাতে আকাশ হতে নাযিল হয়েছে এবং সেখান হতে প্রয়োজন অনুসারে অল্প অল্প করে দীর্ঘ ২৩ বছরে মহানবী (স)-এর উপর নাযিল হয়েছে। নবুওয়াত লাভের পর রাসূলের (স) মাক্কী জীবনের ১৩ বছর এবং মাদানী জীবনে ১০ বছর উক্ত ২৩ বছরে অন্তর্ভুক্ত।

২. এ কুরআনের এক একটি অংশ প্রতি বছর ক্বদরের রাতে দুনিয়ার নিকটতম আকাশে নাযিল হয়েছে এবং ২৩ বছর পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত থাকে।

৩. ক্বদরের রাতে কুরআন নাযিলের সূচনা হয়েছে। এরপর যখন প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, তখনই প্রয়োজন মাফিক বিভিন্ন আয়াত নাযিল হয়েছে। শেষোক্ত ব্যাখ্যাই অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে অনেকে মনে করেন।

দ্বিতীয় পর্যায়ে বায়তুল ইযযাত থেকে মহানবীর (স) প্রতি আল্লাহর নির্দেশে ফেরেশতা জিবরাইলের (আ) মারফতে প্রত্যক্ষ ওহীযোগে প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে কুরআনের আয়াত ও খণ্ড খণ্ড সূরা পর্যায়ক্রমিকভাবে নবী জীবনের সুদীর্ঘ তেইশ বছরকাল ব্যাপী নাযিল হয়। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন-

وَقُرْءَانًا فَرَقْنَٰهُ لِتَقْرَأَهُۥ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَٰهُ تَنزِيلًا

"আমি কুরআন নাযিল করেছি খণ্ড খণ্ড ভাবে, যাতে তুমি তা মানুষের নিকট পাঠ করতে পারো।" (সূরা বনী ইসরাঈল: ১০৬)।

সময় ও স্থান

সর্বপ্রথম ৬০৯ খ্রিস্টাব্দে নবী করীম (স)-এর ৪০ বছর বয়সে রমযান মাসের ক্বদর রাতে 'হেরা গিরি গুহায়' সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত নাযিল হয়।

আল-কুরআন সর্বশেষ আসমানী কিতাব

আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য নাযিল হওয়া সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ এ কিতাব মানব জাতির জন্য এক অনবদ্য অবদান। এ গ্রন্থের ভাব, ভাষা, মর্ম বিষয়বস্তু সবকিছুই মহান আল্লাহর নিজস্ব। অতীতকালীন সকল নবী-রাসূলের দাওয়াত ও সকল আসমানী কিতাবের সারনির্যাস এ কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। আসমানী গ্রন্থসমূহের বর্ণিত সকল তত্ত্ব ও তথ্যের বিস্ময়কর সমাবেশ ঘটেছে এতে। কুরআনের আবির্ভাব ও অবতরণের পর অন্য কোন গ্রন্থের কার্যকারিতা আর নেই। একাধারে পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাবই মানসুখ বা রহিত হয়ে গিয়েছে। এখন এ গ্রন্থই মানব জাতির সামগ্রিক কল্যাণ ও মুক্তির দিশারী বা পথপ্রদর্শক। মহান আল্লাহ বলেছেন-

هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ

"মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন নাযিল হয়েছে।" (সূরা আল-বাকারা : ১৮৫)।

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِى كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيداً عَلَىٰ هَـٰؤُلاَءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

'সেদিন প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে আমি একজন বর্ণনাকারী দাঁড় করাব তাদের বিপক্ষে তাদের মধ্যে থেকেই এবং তাদের বিষয়ে আপনাকে সাক্ষী স্বরূপ উপস্থাপন করব। আপনার উপর এমন কিতাব নাযিল করেছি, যা সকল বিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী এবং আত্মসমর্পণকারীদের জন্য পথের দিশারী, করুণা এবং সুসংবাদদাতা হিসবে।' (সূরা আন-নাহল: ৮৯)

وَمَا كَانَ هَـٰذَا ٱلْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَـٰكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَابِ لاَ رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ

'এ কুরআন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও রচনা নয়। এটা এর পূর্বে যে সব আসমানী কিতাব অবতীর্ণ হয়েছিল, তার সমর্থনকারী। এটা বিধি বিধানসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা দানকারী এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটা বিশ্ব প্রভুর পক্ষ হতে অবতারিত গ্রন্থ।' (সূরা ইউনুস : ৩৭)।

কুরআনের বাহক মহানবী (স) বলেন-

أن هذا القران حبل الله والنور المبين والشفاء النافع لاهلاك لمن تمسك به وخجاة لمن تبعه.

"আল-কুরআন আল্লাহর রজ্জু। আল্লাহর পক্ষ থেকে অতি উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা, কল্যাণময় প্রতিষেধক। যে কুরআনকে আকড়ে ধরবে এবং অনুসরণ করবে সে পাবে মুক্তির পথ, সে কখনও ধ্বংস হবে না।" (হাকিম ও বায়হাকী)

এরপর কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন ঐশী গ্রন্থ অবতীর্ণ হবে না। এটাই আল্লাহর পক্ষ হতে মানব জাতির কাছে সর্বশেষ আসমানী কিতাব। এর আগে মানব জাতির হিদায়াতের জন্য তাওরাত, যাবূর, ইনজীল - এ বড় তিনটি আসমানী কিতাব এবং ১০০ খানা সহীফা বিভিন্ন নবী-রাসূলের কাছে নাযিল হয়েছিল। এগুলো স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই নাযিল করা হয়েছিল। বর্তমানে এ সকল আসমানী কিতাব আসল ভাষা ও অবিকল অবস্থায় সংরক্ষিত নেই। বর্তমানের তাওরাত, যাবুর ও ইনজীল আসল নয়। আসল কিতাব বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হতে হতে হিব্রু এবং গ্রিক ইত্যাদি ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে ইংরেজি ভাষায় আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। বিভিন্ন বিপর্যয় এবং ইয়াহূদী-খ্রিস্টান পাদ্রীদের কারসাজিতে

ঐসব গ্রন্থে ওহীর আসল ভাষা বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

চিরন্তন ও শাশ্বত গ্রন্থ

অতীত যুগের সকল আসমানী গ্রন্থই ছিল নির্দিষ্ট কোন গোষ্ঠী, জাতি বা ভৌগোলিক সীমারেখা বেষ্টিত জনগোষ্ঠীর জন্য এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হিদায়াতের উৎস। কিন্তু কুরআন মাজীদ কোন নির্দিষ্ট জাতি, গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, দেশ বা কালকে কেন্দ্র করে নাযিল হয়নি, বরং ইহা সর্বকালের সমগ্র বিশ্ব মানবতার জন্য সর্বাত্মক হিদায়াতের সওগাত নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। তাই এটা চিরন্তন শাশ্বত ও বিশ্বজনীন গ্রন্থ।

পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা

এ পবিত্র কুরআনই ইসলামী জীবন দর্শন ও জীবনব্যবস্থা তথা ইসলামী শরীআতের মূলনীতি ও অনুশাসনের উৎস এবং পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। পবিত্র কুরআনের উপরই ইসলামের সম্পূর্ণ ইমারতের অবকাঠামো অধিষ্ঠিত। আল্লাহ মানুষকে তাঁর খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন এবং তাদের উপর বিশেষ দায়িত্ব ও কর্তব্য আরোপ করেছেন। আল্লাহ সেই খিলাফতের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দেয়ার জন্য মহাগ্রন্থ আল-কুরআনকে পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা রূপে অবতীর্ণ করেছেন। মানব জাতির বর্তমান ও অনাগত কালের যে সব সমস্যা ও প্রয়োজন দেখা দিতে পারে, তার সব কিছুরই মূলধারা ও মূলনীতি পবিত্র কুরআনে বলে দেয়া হয়েছে। কুরআনে মানব জীবনের ইহকালীন ও পরকালীন সমস্ত কিছুই উল্লেখ করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় কিছুই বাদ রাখা হয়নি। কেননা কুরআনই বিশ্ব মানবতার প্রতি আল্লাহ তা'আলার সর্বশেষ আসমানী নির্দেশনা। এরপর আর কোন আসমানী কিতাব আসবে না।

কুরআনের মাধ্যমে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা পরিপূর্ণ করে দেয়া হয়েছে। এরপর জীবন বিধান হিসেবে কোন কিছুরই প্রয়োজন হবে না।

হযরত মুহাম্মদ (স) বিশ্বনবী এবং সর্বশেষ নবী। তাঁর পরে আর কোন নবী-রাসূল আসবেন না। কাজেই কুরআনের মাধ্যমে ইসলামী জীবনব্যবস্থা পরিপূর্ণ করে দেয়া হয়েছে। এরপর জীবন বিধান হিসেবে জীবন দর্শনরূপে বা জীবন পথের দিশা স্বরূপ কোন কিছুরই প্রয়োজন হবে না।

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম।" (সূরা আল-মায়েদা : ৩)

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ تِبْيَٰنًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

"আমি মুসলিমদের জন্য প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা স্বরূপ, পথনির্দেশ, দয়া ও সুসংবাদ স্বরূপ তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করলাম।" (সুরা আন- নাহল : ৮৯)

هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ

"মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।" (সূরা আল-বাকারা : ১৮৫)

কুরআনের বিধান পরিপূর্ণ এবং যাবতীয় উন্নয়ন ও কল্যাণের চাবিকাঠি।

আল-কুরআনকে পরিপূর্ণভাবে জীবন বিধান হিসেবে মেনে না নিলে, তারা হয় খোদাদ্রোহী কাফির। এ মর্মে আল্লাহ বলেন-

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَافِرُونَ

"আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই কাফির।" (সূরা আল-মায়িদা : ৪৪)

আল-কুরআনের এটা একটি বড় মুজিযা ও বৈশিষ্ট্য যে, কোন মানুষই সেই প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত কুরআনের অনুরূপ বাক্য রচনা করতে পারেনি।

অবিকৃত ও নির্ভেজাল গ্রন্থ

বহু অর্বাচীন যুগে যুগে একে মানব রচিত বলে চরম ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে আনত শিরে স্বীকার করে নিয়ে এর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রামাণিকতা মেনে নিয়েছে। আর এটা যে মহান সত্তা আল্লাহর প্রত্যক্ষ কালাম, নিশ্চিতভাবে খোদায়ী উৎস থেকে উৎসারিত পবিত্র বাণী, তা অকাট্যভাবেই প্রমাণিত হয়েছে বহুভাবে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন গবেষণায় ও পরীক্ষা-নিরীক্ষায়।

আল-কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় আরবগণ নিজেদের ভাষার সাহিত্য রস ও লালিত্য সম্পর্কে গর্ববোধ করতো। অন্য কোন ভাষাকে তারা কোন মর্যাদাই দিত না। এজন্য অনারবদের 'আজমী' বা মূক বলে অভিহিত করতো। যখন হযরত মুহাম্মদ (স)-এর উপর কুরআন অবতরণ শুরু হয়, তখন কুরআনের ভাষার বিশুদ্ধতা ও অলংকার তাদের গর্ব অহংকারকে ম্লান ও নিষ্প্রভ করে দেয়। আল-কুরআনের বাকশৈলী, বলিষ্ঠ যুক্তিধারা ও ভাষার মাধুর্যে বিমোহিত হয়ে লোকেরা ইসলামের দিকে ধাবিত হতে শুরু করে। একে আল্লাহর মহান বাণী বলে গ্রহণ করে। কিন্তু কিছু লোক নিজেদের কুসংস্কার ও জেদের বশবর্তী হয়ে একে মানুষের রচনা বলে অপবাদ রটনা করে। একে কবিতা, জাদু কথা ইত্যাদি বলে উপহাস করে। এতে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এবং অনাগত কাল পর্যন্ত যাদের মনে অমন ধারণা জন্ম নেবে তাদের লক্ষ্য করে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে বলেন, এটা যদি সত্যিই কোন মানুষের রচনা হয়ে থাকে, তাহলে তোমরা অনুরূপ বাক্য রচনা করে দেখাও। আল-কুরআনের এটা একটি বড় মুজিযা ও বৈশিষ্ট্য যে, কোন মানুষই সেই প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত কুরআনের অনুরূপ বাক্য রচনা করতে পারেনি। কিয়ামত পর্যন্ত কোন মানুষ বা জ্বিন তা পারবে না। সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে কুরআনের এ চ্যালেঞ্জ বিগত দেড় হাজার বছর ধরে ছুঁড়ে দেয়া আছে। যুগে যুগে বহু মানুষ বিশেষ করে ইসলাম বিরোধী মহল এমন কি ইয়াহূদী-খ্রিস্টান জগত এ বিজ্ঞানের যুগেও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এ চিরন্তর চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় কেউ সফল হয়নি। কুরআনের বিরোধীরা সর্বাত্মক চেষ্টা করেও যখন ব্যর্থ হল তখন নিজেদের অপরাগতা প্রকাশ করে অকুণ্ঠ চিত্তে তারা বলতে বাধ্য হয়েছে-

ليس هذا من كلام البشر

"'এটা কোন মানুষের বাণী নয়।"

অতীত উম্মতগণ তাদের প্রতি প্রেরিত আসমানী গ্রন্থ এবং তাদের নবীর শিক্ষা কালক্রমে নিজেদের সুবিধামত পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন-বিয়োজন করে বিকৃতির অতলান্তে পৌঁছে ছেড়েছে। কিন্তু পবিত্র কুরআনই কেবল এমন এক গ্রন্থ, যা যাবতীয় বিকৃতির অভিশাপ হতে চির মুক্ত ও চির পবিত্র অবস্থায় অবিকল বিদ্যমান রয়েছে। যেমন: কুরআনের ঘোষণা-

ذَٰلِكَ ٱلْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ

"এতো সেই কিতাব, যাতে কোন সন্দেহ নেই।"(সূরা আল-বাকারা : ২)

জীবন সমস্যার সমাধান

এ মহান গ্রন্থে বিশ্ব মানবতার সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামজিক, অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক, রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক আইন-আদালতসহ সকল ক্ষেত্রের জন্য কুরআন পেশ করেছে চিরন্তর শান্তির সুস্পষ্ট সমাধান।

أن هذا القران حبل الله وهو النور المبين والشفاء النافع عقد تمسك به ونجاة لمن تبعه.

"আল-কুরআন আল্লাহর রশি, আল্লাহর অত্যুজ্জ্বল নূর ও অব্যর্থ মহৌষধ। যে ব্যক্তি কুরআনকে আকড়ে ধরবে, সে পাবে মুক্তি।" (হাকিম ও বাইহাকী)

কুরআন মানুষের চিন্তা ও নৈতিক জগতে অভূতপূর্ব বিপ্লব এনেছে। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনে এক কথায় জীবনের সকল পর্যায়ে এক মহাবিপ্লবের অধিনায়ক হলেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) আর দিশারী মহাগ্রন্থ হল আল-কুরআন।

বস্তুত, আল-কুরআন হচ্ছে মানব ও বিশ্ব জীবন সংক্রান্ত একটি পূর্ণাঙ্গ মহাগ্রন্থ। মহানবী (স) যেভাবে বিশ্বে সকল মানুষের নিকট আল্লাহর প্রেরিত মুক্তিদূত, ঠিক তেমনিভাবে তার উপর প্রেরিত কুরআনও সর্বকালীন মানুষের মুক্তির মহাসনদ। কুরআনের শিক্ষা পূর্ণ, পরিণত, যুক্তিসঙ্গত, পরীক্ষিত সত্য, অদ্বিতীয়। সকল যুগের উপযোগী এবং মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধানকারী। আল-কুরআনের বিধান সর্বকালের গ্রহণীয়, বরণীয় ও সকলের জন্য একান্ত পালনীয়। কুরআন শুধু ধর্মীয় গ্রন্থই নয়, বরং এটা বিশ্বগ্রন্থ। এর আবেদন বিশ্বজনীন। কুরআন শুধু ধর্মীয় নীতি কথাই নয়, বরং এতে আছে ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাহিত্য, রাষ্ট্র ও সমাজের সিকল নিয়ম কানুন, মানব মনের সকল জিজ্ঞাসার জবাব। এতে বৈজ্ঞানিক, রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক পদ্ধতি উপস্থাপন করা হয়েছে। এতে দেওয়ানী, ফৌজদারী আইন, পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনের আইন-কানুন উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যাবতীয় বিধি-বিধান উপস্থাপিত হয়েছে, যা ব্যক্তি, সমাজ এবং রাষ্ট্র এক কথায় সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ হিদায়াত। মানুষের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এতে বিস্তারিত আলোচনা সন্নিবেশিত

হয়েছে। মানুষের শ্রেষ্ঠ মর্যাদার কথা, মানুষের অমরত্বের কথা, মানুষের সম্ভাবনার কথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং বলিষ্ঠভাবে কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে। আর এ কারণেই যুগে যুগে, দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে কুরআনের শিক্ষা মানুষকে আকৃষ্ট করেছে এবং মানব মনকে দোলা দিয়েছে।

মূলত মানব জাতির ইতিহাস পরিবর্তনে মানবতার পূর্ণ বিকাশ ও উন্মেষ সাধনে পবিত্র কুরআনের অবদান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা কুরআন মানুষের চিন্তা ও নৈতিক জগতে অভূতপূর্ব বিপ ব এনেছে। ব্যক্তি, সমাজ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনে এককথায় জীবনের সকল পর্যায়ে এক মহাবিপ্লবের অধিনায়ক হলেন সৃষ্টির সেরা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) আর তার দিশারী হল মহাগ্রন্থ আল-কুরআন।

সারসংক্ষেপ

অতীত নবী-রাসূলগণের দাওয়াত ও হিদায়াতের সমষ্টি এবং সকল আসমানী কিতাবরে সারনির্যাস হল, এ পবিত্র আল-কুরআন। এ গ্রন্থ সকল গ্রন্থের কার্যকারিতা রহিত করে দিয়ে পথভ্রষ্টতার পংকে নিমজ্জিত মানবতাকে চিরায়ত মুক্তির প্রদীপ্ত পথ সিরাতুল মুস্তাকীমের সন্ধান দিয়ে চলেছে যুগ যুগান্তর ধরে।

আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এ মহাগ্রন্থের বৈশিষ্ট প্রসঙ্গে বলেন যে, এটা সেই গ্রন্থ, যা নবীদের উপর অবতীর্ণ সকল গ্রন্থের সত্যতা স্বীকার করে। এ মহাগ্রন্থে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের শিক্ষা ও আদর্শের সারসংক্ষেপ বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ বলেন-

وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَاماً وَرَحْمَةً وَهَٰذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ

"এর পূর্বে ছিল মূসার কিতাব আদর্শ ও অনুগ্রহ স্বরূপ। এ কিতাব এর সমর্থক।" (সূরা আল-আহকাফ : ১২)

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন মহান আল্লাহর বাণী-সমষ্টি। এটা দুনিয়ার প্রচলিত কোন ধর্মীয় পুস্তক বা মানব রচিত কোন পুস্তকের মত গ্রন্থ নয়। বরং এটা মহান আল্লাহ বিশ্ব মানবতার হিদায়াতের জন্য তাঁর মনোনীত সর্বশ্রেষ্ঠ বান্দা ও সর্বশেষ রাসূল হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নিকট বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে নাযিলকৃত প্রত্যক্ষ ওহীর সমষ্টি, যা নবী জীবনের সুদীর্ঘ ২৩ বছরকাল ব্যাপী নাযিল হয়েছিল। এটা ইসলামী শরীআতের মূলনীতি, সমগ্র বিধি-বিধানের উৎস, সর্ববিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের রহস্যাবলীও এতে সন্নিবেশিত। আরবী ভাষায় অবতীর্ণ ও পৃথিবীর সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ।

নোট করুন

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

▶ সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. পবিত্র কুরআন কত সময় ব্যাপী নাযিল হয়-
   ক. ২৩ বছরে;
   খ. ১০ বছরে;
   গ. ১৩ বছরে;
   ঘ. ২৫ বছরে।

২. পবিত্র কুরআন কোন রাতে অবতীর্ণ হয়?
   ক. শবে বরাতে;
   খ. শবে ক্বদরে;
   গ. শবে মিরাজে;
   ঘ. রমযানের রাতে।

৩. পৃথিবীর সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ-
   ক. বাইবেল;
   খ. আল-কুরআন;
   গ. তাওরাত;
   ঘ. বুখারী শরীফ।

৪. সর্বপ্রথম কুরআন নাযিল হওয়া শুরু হয়-
   ক. ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে;
   খ. ৫৭১ খ্রিস্টাব্দে;
   গ. ৬০৯ খ্রিস্টাব্দে;
   ঘ. ৬২২ খ্রিস্টাব্দে।

৫. বিশ্বের মহাবিপ্লবের অধিনায়ক হলেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) আর তার দিশারী হল-
   ক. মহাগ্রন্থ তাওরাত;
   খ. মহাগ্রন্থ ইনযীল;
   গ. মহাগ্রন্থ যাবুর;
   ঘ. মহাগ্রন্থ আল-কুরআন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. সর্বশেষ আসমানী কিতাব কী? প্রমাণ করুন।
২. পবিত্র কুরআন অবতরণের সময়কাল বর্ণনা করুন।
৩. আল-কুরআন যে পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা তা ব্যাখ্যা করুন।
৪. কুরআন যে অতীব বিশুদ্ধ ও নির্ভুল গ্রন্থ তা প্রমাণ করুন।
৫. জীবন সমস্যার সমাধানে আল-কুরআনের অবদান উল্লেখ করুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. 'পবিত্র আল-কুরআনই সর্বশেষ আসমানী কিতাব' বিস্তারিত বিবরণ দিন।
২. পবিত্র কুরআন নাযিলের সময়কাল উল্লেখ করে প্রমাণ করুন আল-কুরআনই একমাত্র নির্ভুল ও অবিকৃত আসমানী কিতাব।

পাঠ-৩

ফেরেশতার পরিচয় ও তাঁদের দায়িত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- ফেরেশতার পরিচয় বলতে পারবেন;
- ফেরেশতা সম্পর্কে ভ্রান্ত বিশ্বাসের বর্ণনা দিতে পারবেন;
- ফেরেশতার সংখ্যা সম্বন্ধে ধারণা দিতে পারবেন;
- ফেরেশতার গুণাবলী ও চরিত্র বর্ণনা করতে পারবেন;
- ফেরেশতার দায়িত্ব-কর্তব্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

ফেরেশতার পরিচয়

ফেরেশতা মহান আল্লাহ তা'আলার অন্যতম এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। তারা মহান আল্লাহর মহাসাম্রাজ্যের অতীন্দ্রিয় কর্মী বাহিনী। মানব চক্ষুর অন্তরালে থেকে মহান আল্লাহর আনুগত্যে নিয়োজিত থাকেন এবং অর্পিত কর্তব্যসমূহ প্রতিপালনে সদা নিমগ্ন থাকেন। আভিধানিক অর্থে আল-মালাইকাহ (ملئكة) বহুবচন, একবচন মালাকুন ملك । অর্থাৎ ফেরেশতা। পারিভাষিক অর্থে ملئكة বা ফেরেশতার পরিচয় দেওয়া হয় এ ভাষায়-

هو جسم نورى يتشكل بأشكال مختلفة لا يأكل ولا يشرب ولا يذكر ولا يؤنث.

"ফেরেশতা জ্যোর্তিময় বা নূরানী দেহবিশিষ্ট। বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করতে পারে। আহারও করে না, পানও করে না। পুরুষও নয়, নারীও নয় .....।"

ফেরেশতা আল্লাহর এক অত্যাশ্চর্য সৃষ্টি, অশরীরী ও অতীন্দ্রিয় জীব। তাঁরা নূর বা আলোর তৈরি, তাদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষভেদ নেই। তাদের পানাহার ও নিদ্রা-বিশ্রামের প্রয়োজন হয় না। তাদের সংখ্যা অগণিত, অসংখ্য, যা কেবল আল্লাহই জানেন।

মূলত ফেরেশতা আল্লাহর এক অত্যাশ্চর্য সৃষ্টি, অশরীরী ও অতীন্দ্রিয় জীব। তাঁরা নূর বা আলোর তৈরি, তাদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষভেদ নেই। তাদের পানাহার ও নিদ্রা-বিশ্রামের প্রয়োজন হয় না। তাদের সংখ্যা অগণিত, অসংখ্য, যা কেবল আল্লাহই জানেন। তারা আল্লাহর বান্দা। তাঁরা সর্বদা আল্লাহর আদেশ পালনে নিয়োজিত আছেন। তাঁদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-"তাঁরা আল্লাহর কথার বিরুদ্ধাচরণ করে না এবং তাঁরা আল্লাহর আদেশ পালনে নিযুক্ত আছেন। আল-কুরআনের আরেক স্থানে আছে, তাঁরা আল্লাহর ইবাদত করতে অস্বীকার করে না এবং পরিশ্রান্তও হয় না।"

ফেরেশতাদের স্বরূপ

ক. ফেরেশতাগণকে পুরুষ বা স্ত্রী জাতি রূপে চিহ্নিত করা যায় না। কারণ তারা পুরুষ না নারী এ বিষয়ে কোন যুক্তি বা প্রমাণ নেই।

খ. কতক ফেরেশতা অন্যান্য ফেরেশতা হতে মর্যাদাবান ও সম্মানিত এবং আল্লাহর সন্নিকটবর্তী।

গ. ফেরেশতাদের সংখ্যা অগণিত, অসংখ্য। তাঁদের সংখ্যা নিরূপণ করা যায় না। তাঁদের সংখ্যা এত বেশি যে, নতুন সৃষ্টির প্রয়োজন হবে না।

ঘ. ফেরেশতাদের চরিত্র পূত-পবিত্র এবং সর্বপ্রকার ক্লেদ-কালিমা হতে মুক্ত। কেননা তাঁরা নূরের তৈরি এবং মানব চরিত্রের ষড়রিপুর আওতামুক্ত।

ফেরেশতাদের সম্পর্কে ভ্রান্ত বিশ্বাস

পৌত্তলিকদের বিশ্বাস : ফেরেশতাগণকে বেশি সম্মান দেখাতে গিয়ে পৌত্তলিকরা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা বলে থাকে। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা ধারণা।

আরববাসী পৌত্তলিকরা কন্যাকে অসম্মানজনক বলে মনে করতো। সুতরাং আল্লাহর সাথে ফেরেশতাগণকে কন্যা সম্পর্ক যুক্ত করাটা আল্লাহর ওপর অসম্মানজনক উক্তি।

ইয়াহূদিদের বিশ্বাস : ইয়াহূদিগণ ফেরেশতাগণের সম্মানকে লাঘব করার জন্য বলে যে, ফেরেশতারা আল্লাহর বিরুদ্ধাচারণ করে। তাদের মতে, ফেরেশতাগণ কুফরী করতে পারে, গুনাহ করতে পারে ও খারাপ কাজ করতে পারে। ফলে আল্লাহ তাদের অপরাধের জন্য শাস্তি দিয়ে থাকেন এবং চেহারা পরিবর্তন করে দেন। কিন্তু ইয়াহূদিদের এ ধারণা ফেশেতাগণের সম্মানের পরিপন্থী, মানহানিকর এবং অবাস্তব।

কারও কারও ধারণা : ইবলীসও ফেরেশতা ছিল। সে আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করেছে। যেমন- কুরআনে বলা হয়েছে, "ইবলীস ব্যতীত সব ফেরেশতাই সিজদা করল।" কাজেই দেখা যায় যে, ইবলীসও ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল কিন্তু এ বিশ্বাস ঠিক নয়। কেননা ইবলীস ছিল জিন, ফেরেশতা ছিল না এবং সে তার প্রভুর বিরুদ্ধাচরণ করেছে।

হারূত-মারূত ফেরেশতাদ্বয় সম্পর্কে বিশ্বাস : হারূত-মারূত ফেরেশতাদ্বয় কুফরী বা কবীরা গুনাহ করেছে বলে ধারণা করা হয়। আসলে এ দু'জন ফেরেশতা কুফরী বা কবীরা গুনাহ করেননি। তবে তাদেরকে যে শাস্তি দেয়া হয়েছিল, তা শুধু তাঁদেরকে শিক্ষাদানের জন্য। যেমন- কোন কোন নবীর সামান্য পদস্খলন ও ভুল সংশোধনের জন্য ও শাস্তি দেয়া হতো। যেমন- নবী যাকারিয়া (আ)-কে করাতে চিরে, ইউনুস (আ)-কে মাছের উদরে পুরে সাবধান করা হয়েছে। তাই হারূত-মারূত সম্পর্কিত ঘটনাবলী ইয়াহূদিদের বানোয়াট রটনা মাত্র।

ফেরেশতাদের সংখ্যা

ফেরেশতাদের সংখ্যা নির্ধারণ তো অসম্ভব বটেই বরং সংখ্যা কল্পনা করাও অসম্ভব। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন-

وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاَّ هُوَ

"তোমার প্রতিপালকের সৈন্য সংখ্যা একমাত্র তিনিই জানেন।" (সূরা আল-মুদাচ্ছির : ৩১)

আল্লাহর সৃষ্টির প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতি পর্যায়ে প্রতিটি স্থানে আল্লাহ ফেরেশতাদের মোতায়েন রেখেছেন।

বস্তুত আল্লাহর সৃষ্টির প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতি পর্যায়ে প্রতিটি স্থানে আল্লাহ ফেরেশতাদের মোতায়েন রেখেছেন। সৃষ্টি জগতের দৃশ্যমান, অদৃশ্যমান সকল কার্য সম্পাদনের পেছনে অদৃশ্য কর্তা ও সম্পাদনকারী হল মহান আল্লাহর সৈনিক, তাঁর আদেশ প্রাপ্ত এসব ফেরেশতা। এছাড়াও রয়েছে আরও অসংখ্য ফেরেশতা, যারা আল্লাহর গুণগান ও তাসবীহ পাঠে রত ও নিমগ্ন রয়েছেন সর্বদা, সার্বক্ষণিকভাবে।

ইমাম রাযী ফেরেশতাদের সংখ্যা বর্ণনা করতে দিতে গিয়ে তার তাফসীরে উল্লেখ করেন-

বনী আদম বা মানবের সংখ্যা হল জিনদের সংখ্যার এক দশমাংশ। জিন ও মানব জাতি মিলে স্থলজ প্রাণীর এক দশমাংশ। এরা সবাই মিলে পাখিদের সংখ্যার এক দশমাংশ। এসব মিলে সামুদ্রিক প্রাণির এক দশমাংশ। এরা সবাই মিলে পৃথিবীতে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত ফেরেশতাদের এক দশমাংশ। এরা সবাই মিলে প্রথম আকাশে নিয়োজিত ফেরেশতাদের এক দশমাংশ। এরা সবাই মিলে তৃতীয় আকাশে নিয়োজিত ফেরেশতাদের এক দমশাংশ। এভাবে সপ্তম আকাশ পর্যন্ত। অতঃপর এ সব সংখ্যা কুরসী -এর ফেরেশতাদের তুলনায় যৎসামান্য। এসব সংখ্যা মিলে আরশ বা সিংহাসনের ৭ লাখ খুঁটির মধ্যে একটি খুঁটিতে নিয়োজিত ফেরেশতাদের এক দশমাংশ। এ প্রত্যেকটি খুঁটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ এবং ছাদের সাথে সকল আকাশ জমিনের বিশালত্ব তুলনামূলকভাবে অতি ক্ষুদ্র এবং অতি স্বল্প। আর এর মধ্যে প্রতিটি পদক্ষেপে রয়েছে অন্তত একজন করে ফেরেশতা, যে সিজদাহ বা রুকু অবস্থায় আছে। অতঃপর পূর্বোক্ত সকল সংখ্যার সমষ্টি আরশের চারদিকে প্রদক্ষিণকারী ফেরেশতাদের তুলনায় সাগরের মধ্যে এক বিন্দু পানির তুলনার মত।

ফেরেশতাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

ফেরেশতাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যকে কয়েক শ্রেণীতে ভাগ করা হয়-

১. **আল্লাহর আনুগত্য :** ফেরেশতাদের সর্বপ্রথম কর্তব্য হচ্ছে, সর্বক্ষেত্রে মহান আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশ করা। যে কোন অবস্থায় আল্লাহর নির্দেশ পালনে সদা প্রস্তুত থাকা এবং তা বাস্তবায়ন করা।

কুরআনে এসেছে-"ফেরেশতাগণ আল্লাহর একান্ত অনুগত ও ফরমাবরদার। তাঁর কোন হুকুমকেই তারা অমান্য করে না।" (সূরা আত-তাহরীম : ৬)

২. **আল্লাহর গুণ-কীর্তন করা :** পবিত্র কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ আছে, ফেরেশতারা সর্বক্ষণ আল্লাহ গুণগান ও প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণায় নিয়োজিত রয়েছেন। যেমন, কুরআনে এসেছে-

وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ

"আমরাই তো তোমার প্রশংসাসহ তাসবীহ পাঠ করছি এবং তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি।" (সূরা আল-বাকারা : ৩০)

৩. **আল্লাহর বাণী বহন :** পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত আছে যে, হযরত জিবরাইল (আ) নবী-রাসূলদের নিকট আল্লাহর বাণী বহন করে নিয়ে আসতেন।

৪. **জীবের জীবিকার ব্যবস্থা ও বণ্টন :** হযরত মীকাঈল (আ) আল্লাহর হুকুমে সমস্ত জীব জন্তুর জীবিকার ব্যবস্থা করেন এবং মেঘ-বৃষ্টি ও বাতাস পরিচালনা করেন।

৫. **শিঙ্গায় ফুক দেয়া :** হযরত ইস্রাফিল (আ) শিঙ্গা নিয়ে আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন। আদেশ পেলেই তিনি শিঙ্গায় ফুক দেবেন। আর তখনই কিয়ামত আরম্ভ হবে।

৬. **জীবের জান কবজ করা :** হযরত আজরাঈল (আ) আল্লাহর আদেশে সমস্ত জীবের জান-কবজ করে থাকেন। অর্থাৎ জীবদের জীবন সংহারের দায়িত্ব পালন করেন।

৭. **মানুষের কর্মের রেকর্ড করা :** 'কিরামুন-কাতিবুন' নামে সম্মানিত ফেরেশতারা মানুষের জীবনের সমস্ত কর্মতৎপরতার রেকর্ড সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করেন।

৮. **দরূদ প্রেরণ :** ফেরেশতারা নবী করীম (স)-এর ওপর দরূদ ও সালাম পেশ করেন।

৯. **ফেরেশতারা আল্লাহর রাজ্যের কর্মীবাহিনী :** পবিত্র কুরআনে ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর সৈনিক বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা সাধারণত কোন কাজ সরাসরি নিজে করেন না। ফেরেশতাদের মাধ্যমেই সাধারণত তিনি কার্য সম্পদান করে থাকেন। তাই ফেরেশতারা আল্লাহর সাম্রাজ্যের কর্মীবাহিনী। বিভিন্ন বিভাগে অসংখ্য ফেরেশতা নিয়োজিত রয়েছেন, যারা পরম নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করেন।

১০. **সব রকম কাজ আঞ্জাম দেয়া :** এছাড়াও পবিত্র কুরআনে ফেরেশতাদের বিভিন্ন কাজের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যেমন- ফেরেশতারা অতিথির ছদ্মবেশে এসে হযরত ইবরাহীম (আ)-কে বৃদ্ধ বয়সে তাঁর পুত্র হওয়ার এবং হযরত মারইয়াম (আ)-কে তাঁর গর্ভে ঈসা (আ) এর জন্মের ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়েছেন। আল্লাহর নির্দেশে ফেরেশতারা বিভিন্ন বিদ্রোহী জাতিকে ধ্বংস করেছিলেন। যেমন- হযরত লুত (আ)-এর কাওম, হযরত হুদ (আ)-এর কাওম। কাফিরদের বিরুদ্ধে মহানবী (আ)-কে সাহায্য করার জন্য আল্লাহ বদর, উহুদ ইত্যাদি যুদ্ধে ফেরেশতা বাহিনী প্রেরণ করেছেন। ফেরেশতারা মুমিনদের বন্ধু, মুমিনদের জন্য তারা মাগফিরাতও প্রার্থনা করেন।

১১. **আরশ বহনকারী ফেরেশতা :** এদের কাজ হল আরশ বহন করা। আল-কুরআনের বাণী-

وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ

"সেদিন আটজন ফেরেশতা তোমার প্রতিপালকের আরশ ধারণ করবে তাদের ঊর্ধ্বে।" (সূরা আল-হাক্কাহ : ১৭)

১২. **আরশের চারিদিকে বেষ্টনকারী ফেরেশতা :** আল-কুরআনের বাণী-

وَتَرَى ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ حَآفِّينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ

"তুমি ফেরেশতাদের দেখতে পাবে যে, তারা আরশের চারপাশে ঘিরে তাদের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে।" (সূরা আয-যুমার :৭৫)

১৩. **শ্রেষ্ঠ ফেরেশতাবৃন্দ :** তারা হলেন-জিব্রাঈল, আজরাঈল ও মিকাঈল (আ)। হাদীসে এসেছে-

আজরাঈল (আ) (ملك الموت) মৃত্যুর দায়িত্বে নিয়োজিত।

অপরজন হলেন-ইসরাফীল (আ)-যাঁর দায়িত্ব হল শিংগায় ফুক দেয়া। আল্লাহ বলেন, "অতপর শিংগায় ফুক দেওয়া হবে, ফলে আকাশ ও জমিনবাসীরা বেঁহুশ হয়ে পড়বে।"

১৪. **জান্নাতের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা :** কুরআনে এসেছে, "ফেরেশতারা তাদের নিকট সকল দরজা দিয়ে ঢুকবে-তোমাদের ধৈর্য ধারণের জন্য তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। 'অবশ্যই পরকালীন পরিণাম কতইনা উত্তম।"

১৫. **জাহান্নামের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা :** আল্লাহ বলেন- عليها تسعة عشر "তার উপর রয়েছে ঊনিশজন ফেরেশতা"। (৭৪:৩০)

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে- আমরা জাহান্নামের দায়িত্বশীল হিসেবে ফেরেশতাদের নিয়োজিত রেখেছি।' (৭৪:৩০)

১৬. **আদম সন্তানের বিষয়ে দায়িত্বশীল :** আল-কুরআনে এসেছে "ফেরেশতাগণ ব্যক্তির ডানে- বামে বসা অবস্থায় আছে। ব্যক্তি যাই উচ্চারণ করুক না কেন, তার জন্যই রয়েছে সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষক দ্রষ্টা।"

১৭. **কর্ম লিখক ফেরেশতা :** এরা হলেন মানুষের আমল সংরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা। আল-কুরআনে এসেছে-

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ .كِرَاماً كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ

"নিশ্চয় তোমাদের উপর রয়েছে তত্ত্বাবধায়কগণ; সাম্মানিত লিপিকরবৃন্দ, তারা জানে তোমরা যা করো।" (সূরা আল-ইনফিতার : ১০-১২)

১৮. **পৃথিবীর বিভিন্ন বিষয়ের দায়িত্বশীল :** এরা পৃথিবীর সব কার্যাবলি সম্পন্ন করে থাকেন, আল-কুরআনে সূরা সাফফাতে এদের বিশ্লেষণ এভাবে দেওয়া হয়েছে। "শপথ তাদের, যারা সারিবদ্ধ দাঁড়ানো, অতপর ভীতি প্রদর্শনকারীদের।"

সূরা জারিয়ায় এসেছে "শপথ ঝঞ্ঝাবায়ুর, অতপর বোঝা বহনকারী মেঘের, অতপর মৃদু চলমান জলযানের, অতপর কর্মবন্টনকারী ফেরেশতাগণের।"

১৯. **কবরে সাওয়ালকারী ফেরেশতা :** আরেকদল ফেরেশতা হলেন তাঁরা, যাঁরা মানুষের মৃত্যুর পর তাদের পার্থিব কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। তাদের বলা হয় মুনকার- নাকীর।

ফেরেশতাদের গুণাবলী

ফেরেশতাগণ আল্লাহর এক অনন্য সৃষ্টি। তাঁরা সর্বদা গর্হিত, অশ্লীল ও অশালীন কার্যাবলি থেকে বিরত থাকেন। তাঁরা পূত-পবিত্র, নিষ্কলুষ, আল্লাহর তাসবীহ পাঠরত। তাঁরা আদেশ পালনে নিয়োজিত। যাদের পাপের ধারণা এবং ধ্বংসশীল মানবীয় গুণাবলি স্পর্শও করতে পারে না। তাফসীরে আল-কবীরে ফেরেশেতাদের গুণাবলীর পর্যায়ে যে সকল ধারণা দেয়া হয়েছে তা নিম্নে তুলে ধরা হল :

১. **রিসালাতের ধারক-বাহক :** ফেরেশতাগণ আল্লাহর রিসালাতের ধারক ও বাহক এক অতীন্দ্রিয় জীব। রিসালাতের দায়িত্ব পালনে তাঁরা সুনিপূণ ও আন্তরিক। আল্লাহ বলেন-

ٱللَّهُ يَصْطَفِى مِنَ ٱلْمَلاۤئِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ ٱلنَّاسِ

"আল্লাহ ফেরেশতাদের মধ্য হতে মনোনীত করেন বাণীবাহক এবং মানুষদের মধ্য হতেও।" (সূরা আল-হাজ্জ্ব : ৭৫)

২. **আল্লাহর সান্নিধ্যে :** ফেরেশতাগণ সবাই আল্লাহর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত। এ সান্নিধ্য হল মর্যদাগত, স্থানগত নয়, তাঁরা সর্বদাই তাঁর নিকেটে থেকে তাঁর ইবাদত করে থাকেন। আল্লাহ বলেন-

وَمَنْ عِنْدَهُ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلاَ يَسْتَحْسِرُونَ

"তাঁর সান্নিধ্যে যারা আছে তারা অহংকারবশে তাঁর ইবাদাত করা হতে বিমুখ হয় না এবং ক্লান্তিও

বোধ করে না।" (সূরা আল-আম্বিয়াহ : ১৯)

৩. **আনুগত্য :** ফেরেশতাদের কাজই হচ্ছে সর্বদা আল্লাহর ইবাদাত ও আনুগত্য করা। তাঁরা এক মুহূর্তের জন্যও ক্ষমা প্রার্থনা-অযিফা থেতে বিরত হন না। বরং প্রতিটি মুহূর্ত তাঁরা প্রতিপালকের তাসবীহ পাঠে অতিবাহিত করেন। আল্লাহ বলেন-

يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لاَ يَفْتُرُونَ

"তাঁরা দিন-রাত তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, তারা শৈথিল্য প্রদর্শন করে না।" (সূরা আল-আম্বিয়া : ২০)

দ্বিতীয়ত: তাঁরা আল্লাহর সামনে দ্রুততার সাথে তাঁর আদেশ পালন করেন। কোন রূপ দ্বিধা-সংকোচ করেন না।

তৃতীয়ত: তাঁরা সকল কাজ তাঁর আদেশে ও নির্দেশে করে থাকেন। নিজেদের ধারণা ও খেয়াল-খুশিমত কোন কাজ করেন না। আল্লাহ বলেন-

لاَ يَسْبِقُونَهُ بِٱلْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ

"তারা তাঁর আগে সম্মুখে কখনও কথা বলে না এবং তারা তাঁর নির্দেশ অনুযায়ীই কাজ করে থাকে।" (সূরা আল-আম্বিয়া : ২৭)

৪. **প্রচণ্ড শক্তি :** ফেরেশতাগণ প্রচণ্ড শক্তিধর। তাঁরা আল্লাহর ইচ্ছায় যে কোন কাজই সম্পাদন করতে পারেন। আরশের মত এত বিশাল জিনিসকে মাত্র ৮জন ফেরেশতা ধারণ করে আছেন। এ ছাড়া হযরত ইসরাফীল (আ) শিংগায় ফুঁক দিলে তার আওয়াজের প্রচণ্ড শব্দে ভেঙ্গে চুরে ফেটে ধংস হয়ে যাবে এ মহাবিশ্বের সমস্ত ব্যবস্থাপনা। দোযখের মত বিশাল ব্যবস্থা ১৯ জন ফেরেশতা সংরক্ষণ করছেন।

হযরত জিব্রাঈল (আ) পর্বতকে বাণী ইসরাঈলের মাথার উপর তুলে ধরেন। এ সবই তাঁদের শক্তির প্রচণ্ডতা বুঝায়। আল্লাহ বলেন-

عَلَيْهَا مَلاَئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَّ يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ

"কঠোর স্বভাবের ফেরেশতাগণ, যারা অমান্য করেনা তা, যা আল্লাহ তাদের আদেশ করেন।" (সূরা আত-তাহরিম : ৬)

৫. **ভয়-ভীতি :** ফেরেশতাগণ আল্লাহ তা'আলাকে যেমন ভালবাসেন, তেমনি প্রচণ্ড ভয়ও করেন। মহান প্রতিপালক আল্লাহর ভয়ে তাঁরা সর্বদাই কম্পমান থাকেন। তাঁরা এত ইবাদত, তাসবীহ ও তাহমীদ সত্ত্বেও সর্বদা এ ভয়ে থাকেন যে, তাঁদের সব ইবাদত আবার অপরাধে রূপান্তরিত হয়ে যায় কিনা। আল্লাহ বলেন-

إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُونَ

"নিশ্চয় যারা তাদের প্রতিপালকের ভয়ে সন্ত্রস্ত।" (সূরা আল-মমিনূন : ৫৭)

আল্লাহ বলেন,"যখন তাদের অন্তঃকরণ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে, তখন তাঁরা বলবে, তোমাদের প্রতিপালক কী বলেছেন? তারা বলবে, 'সত্য'। তিনি তো মহীয়ান, গণীয়ান।'

সারসংক্ষেপ

ফেরেশতা আল্লাহ তা'আলার অন্যতম এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। তাঁরা মহান আল্লাহর মহাসাম্রাজ্যের অতীন্দ্রীয় কর্মীবাহিনী।

তাঁরা নূর বা আলোর তৈরি, তাঁদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ ভেদ নেই। তাঁদের পানাহার, নিদ্রা ও বিশ্রামের প্রয়োজন হয় না। তাঁদের সংখ্যা অগণিত, অজস্র, অসংখ্য যা কেবল আল্লাহই জানেন। তাঁরা আল্লাহর বান্দা। তাঁরা সর্বদা আল্লাহর আদেশ পালনে নিয়োজিত আছেন। এদের কোন নিজস্ব মত ও কর্মসূচী নেই। মানব চোখের অন্তরালে তাঁরা অবস্থান করে মহান আল্লাহর আনুগত্যে নিয়োজিত থেকে তাঁর অর্পিত কর্তব্যসমূহ প্রতিপালনে সদা নিমগ্ন থাকেন।

বস্তুত ফেরেশতাদের জীবন ও কর্ম সবই মহান প্রতিপালক আল্লাহর ইবাদাতে নিবেদিত। তাঁরা দুনিয়ার সকল প্রকার কামনা-বাসনা ও লালসা মুক্ত থাকায় সর্বদাই মহাপ্রভুর তাসবীহ পাঠরত থাকেন। তাঁর আদেশ-নিষেধ পুরোপুরিভাবে মেনে চলেন। আল্লাহর প্রতি ভালবাসা ও ভয়ে তাদের জীবন ও কর্ম সমৃদ্ধ। তাঁদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা প্রতিটি বিশ্বাসী মানুষের জন্য অপরিহার্য।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

▶ সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. মালাইকা মানে কী?
   ক. ফেরেশতা; খ. জিবরাইল;
   গ. জিন; ঘ. পরী।

২. ফেরেশতাকে বেশি সম্মান দেখাতে গিয়ে পৌত্তলিকরা তাদেরকে কী মনে করে?
   ক. আল্লাহর পুত্র; খ. আল্লাহর কন্যা;
   গ. আল্লাহর স্ত্রী; ঘ. আল্লাহর সন্তান।

৩. ফেরেশতার সংখ্যা কত?
   ক. ২,২৪০০; খ. অগণিত;
   গ. জানা নেই; ঘ. কোটি কোটি।

৪. কবরে সাওয়ালকারী ফেরেশতাদের নাম কি?
   ক. মুনকার-নাকীর; খ. কিরামুন-কাতিবীন;
   গ. আজরাইল-মিকাইল; ঘ. জিবরাঈল-ইসরাফীল।

৫. দোযখের ব্যবস্থাপনায় কয়জন ফেরেশতা রয়েছেন?
   ক. দুই লাখ; খ. অসংখ্য;
   গ. ১৯ জন; ঘ. ৮ জন।

৬. 'মালাকুল মাওত' কোন ফেরেশতাকে বলা হয়?
   ক. আজরাইল; খ. জিবরাইল;
   গ. মিকাঈল; ঘ. ইসরাফীল।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. ফেরেশতার পরিচয় দিন।
২. ফেরেশতার সংখ্যা সম্বন্ধে লিখুন।
৪. ফেরেশতার শ্রেণি বিভাগ সম্পর্কে ইমাম রাযীর (র) বক্তব্য-বিশ্লেষণ উল্লেখ করুন।
৫. ফেরেশতার গুণাবলি সম্বন্ধে বিবরণ দিন।
৬. ফেরেশতার দায়িত্ব-কর্তব্য সম্বন্ধে আলোকপাত করুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. ফেরেশতার পরিচয় দিন। ফেরেশতার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করুন।